08/10/2015

XXCE

বন্দে মাতরম্

আনন্দবাজার পত্রিকা

৯৪ বর্ষ ২১৫ সংখ্যা বৃহস্পতিবার ২১ আশ্বিন ১৪২২ কলকাতা

## যত দিন, তত দিন

গণমাধ্যমের ক্যামেরা তাক করিলে গ্রেফতার হওয়া পাকা অপরাধীরাও মুখ ঢাকে। পশ্চিমবঙ্গের নির্বাচন কমিশনার লইয়া যে কুনাট্য চলিতেছে, তাহাতে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আর সেই আড়ালটুকুও রাখিলেন না। আলাপন বন্দ্যোপাধ্যায়কে অস্থায়ী কমিশনারের পদে বসাইয়া তিনি যে বার্তা দিলেন, তাহা দ্ব্যর্থহীন: গণতন্ত্রের তোয়াক্কা তিনি আর করেন না। কে কী বলিল, কোন সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানের কতখানি অমর্যাদা হইল, সবই তাঁহার নিকট অবান্তর। প্রতিটি প্রতিষ্ঠানে তিনি নিজের লোক চাহেন, যে কোনও মূল্যে। এই চাহিদাটি যে তাঁহারই প্রথম, এমন কথা বলিবার উপায় আলিমুদ্দিন স্ট্রিটের কর্তারা রাখেন নাই। কিন্তু, তাঁহাদের চক্ষুলজ্জাটুকু ছিল। নিয়মের কাঠামো বজায় রাখিয়াই নিজেদের লোক খুঁজিয়া লওয়ার প্রথাটি তাঁহারা মানিতেন। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আর সেই ধার ধারেন নাই। তিনি একেবারে তাঁহার সরকারের পরিবহণ সচিবকেই চেয়ারে বসাইয়া দিয়াছেন। এবং বুঝাইয়াছেন, শিক্ষামন্ত্রী হইবার সুবাদে পার্থ চট্টোপাধ্যায় যেমন পশ্চিমবঙ্গের যাবতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের মালিক, তেমনই তিনিও মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে নির্বাচন কমিশনের মালিক। সেই মালিকানা যদি সংবিধানে স্বীকৃত না হয়, তাহা যদি অনৈতিক হয়, এমনকী বেআইনিও হয়, তবুও থোড়াই কেয়ার।

এই নিয়োগ বে-আইনি কি না, সেই প্রশ্ন অনিবার্য ভাবেই উঠিতেছে। নবান্নের তরফে বলা হইতেছে, রাজ্য নির্বাচন কমিশন আইনের ধারায় কোনও কর্তব্যরত অফিসারকে অস্থায়ী নির্বাচন কমিশনার হিসাবে নিয়োগ করিবার অনুজ্ঞা রহিয়াছে। এই ধারার বৈধতা লইয়া হয়তো মামলা হইবে। মামলার রায়ে যদি ধারাটি টিকিয়া যায়, তাহা বিস্ময়কর হইবে। নবান্ন সূত্রে খবর, আলাপনবাবু যত দিন নির্বাচন কমিশনারের দায়িত্ব পালন করিবেন, তত দিন তিনি পরিবহণ সচিব হিসাবে কাজ করিবেন না। এমন ব্যবস্থা দেখিয়া হীরক রাজ্যের রাজজ্যোতিষীর কথা মনে পড়া বিচিত্র নহে। তবে, তিনি পরিবহণ সচিবের দায়িত্ব পালন করিলেন কি না, সেই প্রশ্ন অবান্তর। যখন তাঁহাকে নির্বাচন কমিশনারের দায়িত্বটি দেওয়া হয়, তখনও তিনি সরকারি কর্মী ছিলেন, এখনও আছেন। সুপ্রিম কোর্টের একটি রায় অনুযায়ী, কোনও কর্মরত সরকারি আমলা এই পদে বসিতে পারেন না। অতএব তাঁহাকে নিয়োগ করিবার সিদ্ধান্তটি আইনগত দিক দিয়া কতটা ঠিক, সেই প্রশ্ন রহিয়া গেল।

কিন্তু আইনের প্রশ্নটি শেষ বিচারে গৌণ। নির্বাচন কমিশনের প্রধান হিসাবে আলাপন বন্দ্যোপাধ্যায়ের নিয়োগ চূড়ান্ত অনৈতিক। তিনি চাকুরিরত আমলা। চাকুরির শর্ত মানিয়াই তিনি রাজ্য সরকারের অধীন। নির্বাচন কমিশন কোনও অর্থেই রাজ্য সরকারের অধীনে থাকা প্রতিষ্ঠান নহে। বস্তুত, প্রশাসন হইতে স্বাতন্ত্র্যই তাহার স্বাধীন অস্তিত্বের আবশ্যিক শর্ত। গণতন্ত্রের স্বাস্থ্যের পক্ষে এই স্বাতন্ত্র্য অপরিহার্য। এই অতি জরুরি প্রতিষ্ঠানের প্রধান পদে নিযুক্ত হইবার প্রথম শর্তই নিরপেক্ষতা। ব্যক্তি আলাপন বন্দ্যোপাধ্যায় নিরপেক্ষ থাকিতে চাহিবেন কি না, তাঁহার পক্ষে নিরপেক্ষ থাকা সম্ভব কি না, প্রশ্নগুলি অবান্তর। কারণ, চাকুরিসূত্রেই তাঁহার পক্ষে মুখ্যমন্ত্রীর অধীনতা অস্বীকার করা অসম্ভব। আপাতত সচিবের দায়িত্ব ছাড়িলেও তিনি প্রতি মুহূর্তে জানিবেন, নির্বাচন কমিশনারের অস্থায়ী মেয়াদ ফুরাইলে তাঁহাকে ফের মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের অধীনেই ফিরিতে হইবে। এমন অবস্থায় নিরপেক্ষ ভূমিকা বজায় রাখিতে প্রায় অলৌকিক সাহসের প্রয়োজন। তাহার সন্ধান মিলিবে, সে আশা ক্ষীণ। প্রশাসনের অন্দরমহল হইতে এক আমলাকে নিয়োগ করিয়া যে ভাবে নির্বাচন কমিশনের স্বাধীন সত্তাটির অপমান করা হইয়াছে, তাহাই অন্যায়ের মূল। তাহাতে স্বৈরতন্ত্রের পদধ্বনি প্রবল।

## আলো নিবিতেছে

মহম্মদ আখলাকের হত্যার ঘটনাটি যত ভয়ানক, তাহার প্রতিক্রিয়া (বা অ-প্রতিক্রিয়া) তদপেক্ষা কম ভয়ানক নয়। এই 'ধর্মনিরপেক্ষ গণতান্ত্রিক' দেশে বাড়িতে গোমাংস রাখিবার অভিযোগে এক ব্যক্তিকে গভীর রাতে বাড়ি হইতে বাহির করিয়া পিটাইয়া মারিয়া ফেলিবার ঘটনাকেও যে বিবিধ প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ যুক্তিতে সমর্থন করা যায়, তাহা দেখাইয়া দিতেছেন ভারতীয় জনতা পার্টির নেতারা। অর্থমন্ত্রী অরুণ জেটলি বলিয়াছেন, ভারতের নাম ইহাতে ডুবিতেছে, তাই এমন ঘটনা ঘটা উচিত নহে। যেন ভারতের নামের প্রশ্নটি ছাড়া এক নিরপরাধ প্রৌঢ়কে গণপিটুনিতে মারিবার মধ্যে আর কোনও চিন্তার বিষয় নাই। বিজেপি সাংসদ তরুণ বিজয় বলিয়াছেন, কোনও প্রমাণ ব্যতিরেকে কেবলমাত্র সন্দেহের ভিত্তিতে এমন ঘটনা দুর্ভাগ্যজনক। তাঁহার যুক্তিধারাটি জলবৎ সরলম্: প্রমাণ থাকিলে পিটাইয়া মারাই যায়, অসুবিধা কী। স্থানীয় সাংসদ-নেতা মহেশ শর্মা আরও এক কাঠি বিবেচনার পরিচয় রাখিয়াছেন, মহম্মদ আখলাকের অনূঢ়া কন্যা বাড়িতে থাকা সত্ত্বেও অক্ষত থাকিতে পারিয়াছেন, সে দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া। সব মিলাইয়া নেতারা কে কাহাকে ছাড়াইবেন, তাহার ধুম পড়িয়াছে। বিরোধী নেতারাও তথৈবচ। রাহুল গাঁধী মাত্র এক সপ্তাহ পর অকুস্থলে যাইবার সুযোগ পাইয়াছেন। রাজনীতির স্বার্থে কোনও কোনও নেতা আখলাকের বাড়িতে প্রমোদভ্রমণে যাইতেছেন। টিভি চ্যানেলে সরকারি ও বিরোধী পক্ষের 'যুক্তিবাদী'রা গোহত্যা এবং গোমাংস ভক্ষণের নৈতিকতা লইয়া আক্রমণ এবং আত্মপক্ষ সমর্থন চালাইতেছেন। যেন এই প্রসঙ্গে ইহাই প্রধান আলোচ্য।

প্রকৃত আলোচ্য যে একটি গণতান্ত্রিক দেশের ব্যক্তির অধিকার; নিজ রুচিমতে চলিবার ও বাঁচিবার অধিকার, এবং সেই সূত্রে প্রাণের সুরক্ষার দাবি, কুযুক্তি ও কুতর্কের আবরণে সেই কথাটি এখনও আশ্চর্য ভাবে আবৃত। একটি ধর্মনিরপেক্ষ দেশে স্বাধীন ধর্মাচার পালনের প্রশ্নেরও আগে আসে গণতান্ত্রিক অধিকারের দাবি। কোনও মতেই যে তাহা ত্যক্ত বা দলিত হইতে পারে না। কেন্দ্রীয় প্রশাসন, রাজ্য প্রশাসন, কিংবা রাজনৈতিক দল, কোনও পক্ষ হইতেই এই মৌলিক কথাটিতে জোর দেওয়া হইল না। যাঁহার কাছ হইতে এই কথা সর্বাগ্রে আসিবার কথা ছিল, তিনি যে এমন কথা বলিবেন না, অতীত অভিজ্ঞতা হইতে জানাই ছিল। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর মুখে সম্পূর্ণ কুলুপ। গত কয়েক দিনে বহু গভীর বাণী, বিশেষত অন্যান্য রাষ্ট্র ও রাষ্ট্রনেতা বিষয়ে গদগদ প্রশংসাবাক্য তাঁহার মুখনিঃসৃত হইয়াছে, কিন্তু নিজ দেশে গণতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতার উপর এই ভয়ঙ্কর নৃশংস আক্রমণ বিষয়ে বলিবার মতো তিনি কিছুই খুঁজিয়া পান নাই।

প্রথম কথার পাশে একটি প্রথম কাজও ছিল। অভিযুক্তদের কঠিন শাস্তিদান। গো-হত্যা বিষয়ক নীতিভাবনা, কিংবা মহম্মদ আখলাকের বাড়িতে ফ্রিজের মাংসটি পাঁঠা না গোমাংস ইত্যাদি বিবেচনা, সবই অপেক্ষা করিতে পারে। কিন্তু সর্বপ্রথমে যে ইহা আইনশৃঙ্খলার প্রশ্ন, এবং দেশের আইনমাফিক যে হত্যাকারীদের পত্রপাঠ গ্রেফতার করা উচিত, এ বিষয়ে দ্বিমত থাকিতে পারে না। কিন্তু গণতান্ত্রিক ভারত বিশ্বের দরবারে রাষ্ট্রপুঞ্জের নিরাপত্তা পরিষদে বিশেষ আসন দাবি করিতে পারিলেও নিজের মাটিতে এইটুকু আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা করিতে অক্ষম। অন্ধকার রাজনীতির দেশে অন্ধতা ও অনধিকারের চর্চা অধিকারের আলোকটিকে ইতিমধ্যেই নিবাইয়া বসিয়াছে।

# এই হিংসার পিছনে যে অর্থনীতি

**অসীম চট্টোপাধ্যায়**

**আমরা গাছ দেখি, অরণ্য দেখি না। যে লুম্পেন রাজত্ব পশ্চিমবঙ্গে কায়েম হয়েছে, তার পিছনে আছে লুম্পেন পুঁজির কারবার। বেআইনি লগ্নি সংস্থার কেলেঙ্কারি আর রাজনীতির মঞ্চে এই তাণ্ডব সেই একই উৎস থেকে সঞ্জাত।**

আমাদের বিস্ময়বোধ যে কত প্রবল, রাজ্যে ঘটে চলা পুনরাবৃত্ত অপকর্মগুলিতে তার পরিচয় মিলেছে। কখনও কামদুনির মতো ধর্ষণকাণ্ডের বীভৎসতায়, কখনও বা তোলাবাজি প্রসূত হিংসার নৃশংসতায় বা সিন্ডিকেট-রাজের উন্মত্ততায়, কখনও আবার সাম্প্রতিক পুরনির্বাচনের বর্বরতায় স্তম্ভিত আমাদের বিস্ময়ের শেষ নেই। অথচ পুনরাবৃত্ত এই অপকর্মগুলির উৎস যে রাজ্যে বিদ্যমান লুম্পেন রাজত্ব সে বিষয়ে আমাদের আগ্রহ আর একটু গভীর হলে অবশ্যই এই রাজত্ব নির্মাণে ও বিকাশে বেআইনি লগ্নি সংস্থার— তথাকথিত চিটফান্ড-এর— ভূমিকা জনমানসে প্রতিষ্ঠিত হতে পারত। আক্ষেপের কথা, আমরা প্রায়শই বিচ্ছিন্ন বৃক্ষগুলিকে দেখি, কিন্তু এই বৃক্ষরাজির সমাহারে সৃষ্ট অরণ্য আমাদের চোখে পড়ে না।

অথচ রাজ্যে ক্ষমতাসীন দল ও নেতানেত্রীদের সঙ্গে বেআইনি লগ্নি সংস্থাগুলির যোগাযোগ যে কত নিবিড় ও কত গভীর, তা এখন উন্মোচিত। শাসক দলের এক সাংসদ জেলে, মুখ্যমন্ত্রীর দাক্ষিণ্য সত্ত্বেও এক মন্ত্রী জেলবন্দি, শাসক দলের একগুচ্ছ কেষ্টবিষ্টু জামিনে খালাস, রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ না হলে আরও কত নেতা-মন্ত্রী ধরা পড়তেন কে জানে। হিমালয়ের কোলে গভীর রাতের নির্জনতায় ডেলো বাংলোর বৈঠকের কথা সর্বজনবিদিত। এই সংস্থাগুলির প্রত্যক্ষ মদতেই যে শাসক দল ক্ষমতাসীন হয়েছে, এই সত্য এখন আর কোনও গোপন কথা নয়। রাজ্যে ক্রমবর্ধমান মাৎস্যন্যায়কে বোঝার জন্য তাই বেআইনি লগ্নি সংস্থার রহস্য বোঝা জরুরি।

অনেকেই ভেবেছিলেন জনস্মৃতি স্বল্পায়ু হওয়ার কারণে চিটফান্ড নিয়ে 'হুজুগ' অচিরেই হাওয়ায় মিলিয়ে যাবে। কিন্তু যায়নি। রাজনৈতিক তাৎপর্য ছাড়াও এর কারণ হল, এই সংস্থাগুলির প্রতারণার আকার ও প্রকার। স্পষ্ট করে বলা দরকার, প্রতারিত আমানতকারীর সংখ্যা নব্বই লক্ষেরও বেশি। শুধু সারদাকাণ্ডে, যেখানে সংগৃহীত অর্থের পরিমাণ, সরকারি মতে ২৪০০ কোটি টাকা (আসলে আরও বেশি), সেখানেই আমানতকারীর সংখ্যা, শ্যামল সেন কমিশনের তথ্য অনুযায়ী, ১৮ লক্ষের বেশি। রোজভ্যালি (৯৭৬০০ কোটি টাকা), এমপিএস (১০০০০ কোটি) বা অ্যালকেমিস্ট সারদার থেকে অনেক বড়। তাই মোট আমানতকারীর সংখ্যা নব্বই লক্ষের বেশি হওয়া স্বাভাবিক। গড়ে পাঁচ জনের পরিবার ধরলে রাজ্যে প্রায় সাড়ে চার কোটি মানুষ এই প্রতারণায় ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন। এ যাবৎ আত্মঘাতী হয়েছেন ১২৪ জন। ঘটনা হল, টাকা ফেরত পাওয়ার আন্দোলন বন্ধ হলে বা টাকা ফেরতের আশা জলাঞ্জলি দিতে হলে রাজ্য জুড়ে অপ্রতিরোধ্য মৃত্যুমিছিল শুরু হবে।

বেআইনি লগ্নি সংস্থার সংখ্যা নিয়েও অনেক ধোঁয়াশা। এই আলোচনায় প্রায় পঞ্চাশ-ষাটটি সংস্থার নাম আসে, তাদের মধ্যে গোটা পঁচিশেকের নাম বেশি আসে। অথচ হাইকোর্টেই নথিভুক্ত হয়েছে ৫৭২টি সংস্থা, সুনির্দিষ্ট এফআইআর হয়েছে ৫২৭টির নামে। আসলে নিত্যনতুন সংস্থা বাজারে নেমে পড়েছে এবং এদের অনেকেই পনেরো-কুড়ি কোটি টাকা হাতিয়ে নিয়ে হাওয়া হয়ে গিয়েছে। এই দুর্নীতি অভূতপূর্ব। সাধারণ দুর্নীতিকাণ্ডে প্রতারিত হন সচ্ছল মানুষজন। কিন্তু এ ক্ষেত্রে প্রতারিতদের আশি শতাংশই সমাজের সর্বনিম্ন স্তরের শ্রমজীবী মানুষ: মুটে, মজুর, রিকশা-ভ্যান-ঠেলা চালক, রাস্তার সবজিওয়ালা, গৃহপরিচারিকা, রাঁধুনি, ইত্যাদি। এই অতি গরিব মানুষদের টাকা মেরে প্রতারণার কারবারিদের এত রমরমা এবং তাদের মাধ্যমে শাসকদের মেলা-খেলা-উৎসব, মোচ্ছব, নির্বাচনী প্রচারের জাঁকজমক, বিভিন্ন ধরনের অনুদান, বাহুবলী তোষণ মহাসমারোহে চলেছে।

অথচ এক দিকে লক্ষ লক্ষ আমানতকারী সর্বস্বান্ত হয়েছেন, হাজার হাজার এজেন্ট ঘরছাড়া হয়েছেন, শতাধিক আমানতকারী-এজেন্ট আত্মঘাতী হয়েছেন, অন্য দিকে প্রতারক মালিকদের অধিকাংশই লুঠের টাকায় সুখে দিন কাটাচ্ছেন। অনেকেই আশা করেছিলেন, এই অবস্থায় সস্তা জনবাদিতায় আচ্ছন্ন মুখ্যমন্ত্রী এই সর্বস্বান্ত হতদরিদ্র মানুষদের পাশে দাঁড়াবেন। কিন্তু মমতাদেবী মালিকদের পক্ষ নিয়েছেন। তিনটি ঘটনায় এই সত্য স্পষ্ট হয়ে গিয়েছে।

ঘটনা এক, আমানতকারীদের অর্থ ফেরত দেওয়ার যে দায় সংশ্লিষ্ট লগ্নি সংস্থার মালিকদের, শ্যামল সেন কমিশন গঠন করে জনসাধারণের টাকায় সেই দায় ঘাড়ে নিয়ে মুখ্যমন্ত্রী মালিকদের পক্ষে দাঁড়ালেন। সুপ্রিম কোর্টে সিবিআই তদন্ত ঘোষিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কমিশন গুটিয়ে দিয়ে স্পষ্ট করে দিলেন এই সত্য যে, আমানতকারীদের রিলিফ দেওয়া নয়, বরং মালিকদের স্বার্থে সিবিআই তদন্ত যেন তেন প্রকারেণ আটকানোর তাগিদেই কমিশন গঠন করা হয়েছিল। ঘটনা দুই, সিবিআই তদন্ত আটকানোর লক্ষ্যে মুখ্যমন্ত্রী দাবি করেন যে চিটফান্ড কাণ্ডের তদন্তভার গ্রহণের দায়িত্ব নেওয়ার ক্ষমতা রাজ্যের রয়েছে এবং সেই জন্য সাততাড়াতাড়ি বিশেষ তদন্তকারী দল ('সিট') গঠন করেন তিনি, যার বিরুদ্ধে সত্য উন্মোচনের বদলে সত্য গোপন করা ও সাক্ষ্যপ্রমাণাদি লোপাট করার অভিযোগ উত্তরোত্তর প্রবল হয়ে ওঠে। অথচ সিবিআই তদন্তে সহযোগিতার প্রশ্নে তিনিই সামর্থ্যের অপ্রতুলতার কথা বলে সেই দায় এড়িয়ে যান। ঘটনা তিন, মালিকদের পক্ষে মুখ্যমন্ত্রীর সবচেয়ে উৎকট পদক্ষেপ হল, সিবিআই তদন্ত আটকানোর জন্য জনসাধারণের করের টাকায় বারো কোটি টাকা ব্যয়ে সুপ্রিম কোর্টে মামলা করে রাজ্য সরকারের সিবিআই তদন্ত রোধের প্রাণপণ প্রয়াস। এই সব ঘটনা এবং তার অন্তর্নিহিত কার্যকারণসূত্রগুলি থেকেই উৎসারিত হয়েছে বেআইনি লগ্নি সংস্থাগুলির রাজনৈতিক তাৎপর্য। এখানে তিনটি কথা বলা জরুরি।

এক, বেআইনি লগ্নি কারবারের টাকাতেই শাসক দল রাজ্যে ক্ষমতাসীন হয়েছে, এ কথা যেমন সত্য, তেমনই মহাসত্য হল এটাই যে, রাজ্যে এখন যে লুম্পেন রাজত্ব কায়েম হয়েছে, তার অর্থনৈতিক ভিত্তি হল এই কারবারের লুম্পেন পুঁজি। উৎপাদনের মাধ্যমে উদ্বৃত্ত আহরণ করে সনাতন পুঁজির বৃদ্ধি ঘটে, তা হল 'ভার্টিকাল' বা উল্লম্ব বৃদ্ধি। কিন্তু এই লুম্পেন পুঁজির ক্ষেত্রে উৎপাদনের কোনও গল্প নেই, আরও বেশি বেশি মানুষকে প্রতারণার আওতায় এনে এই পুঁজির বৃদ্ধি ঘটে— 'হরাইজন্টাল' বা অনুভূমিক বৃদ্ধি। কোনও উদ্বৃত্ত মূল্য তৈরির ক্ষমতা এই পুঁজির নেই, এতে কোনও শিল্প গড়ে ওঠে না, শুধু বিলাসব্যসনে, ফাটকাবাজিতে, অনুদানের বদান্যতায় বা বাহুবলী পোষণে এই পুঁজি ব্যয়িত হয়। সেই কারণেই এই পুঁজি হল লুম্পেন পুঁজি। এই পুঁজিতে কামান দাগাই বিদ্যমান লুম্পেন রাজত্ব অবসানের আবশ্যিক শর্ত। অন্যথা, শুধু তোলাবাজি, মারদাঙ্গা, ধর্ষণ, সিন্ডিকেট রাজের বিরুদ্ধে হাজার গর্জনও ফলদায়ী হবে না। গোড়া না কেটে আগা ছেঁটে লাভ নেই।

দুই, চিটফান্ড প্রশ্নে সুপ্রিম কোর্টের রায়ে সিবিআই তদন্ত নির্দেশিকায় বলা হয়েছে, 'টাকা কোথায় গেল, কার পকেটে গেল' জানতে হবে, 'এই টাকা উদ্ধার করে আমানতকারীদের ফেরত দেওয়ার ব্যবস্থা' করতে হবে এবং প্রয়োজনে এর পশ্চাতে যে 'বৃহত্তর ষড়যন্ত্র' রয়েছে তার উন্মোচন করতে হবে। তদন্তপ্রক্রিয়ায় কোনও রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ না হলে এই 'মানি ট্রেল' শাসক দলের, এমনকী খোদ মুখ্যমন্ত্রীর দরজায় পৌঁছে যেতেই পারে। সে-ক্ষেত্রে যা যা ঘটবে, তার পরিণামে তৃণমূল-কংগ্রেসের ক্ষমতায় ফেরার সম্ভাবনা তো বটেই, তার অস্তিত্বই বিপন্ন হতে পারে। মুখ্যমন্ত্রী এই সত্য বোঝেন, সে কারণেই সিবিআই তদন্ত ধামাচাপা দিতে বা বন্ধ করতে আপ্রাণ চেষ্টা করেন। সে চেষ্টা ব্যর্থ হওয়ার পর তিনি মোদীর প্রতি অনুকূল হয়ে ওঠেন, যে মোদীকে কোমরে দড়ি দিয়ে ঘোরানোর কথা তিনি কিছু দিন আগেই ঘোষণা করেছিলেন। প্রথমে মোদী সাড়া দেননি, বিজেপি তখন রাজ্যে ক্ষমতার গন্ধে মশগুল ছিল। কিন্তু পুরনির্বাচনে প্রতিষ্ঠিত হয় যে, এ রাজ্যে বামপন্থীরাই বিকল্প হবে, বিজেপি নয়। বিজেপির এই উপলব্ধি, কর্পোরেট পুঁজির দাবি মোতাবেক, মমতা-মোদীর সমঝোতাকে অনিবার্য করে তুলেছে, সিবিআই তদন্তও গতি হারিয়েছে।

তিন, পুঁজিবাদী সমাজ গঠনে 'প্রাইমারি অ্যাকিউমুলেশন'-এর যে ভূমিকা, আমাদের লুম্পেন রাজত্ব কায়েম করার ক্ষেত্রে সেই ভূমিকা পালন করেছে লুম্পেন পুঁজি। এই জন্মচিহ্ন শাসক দলের কর্মকাণ্ডে ছাপ ফেলেছে। রাজ্যে ক্ষমতাসীন হওয়ার আগে চিটফান্ড পুঁজির সহায়তায় তৃণমূল কংগ্রেসের যে মেটামরফসিস, যার জোরে শীর্ণকায় উপদল সম টিএমসি হঠাৎ মেগা সংগঠনের নির্বাচনী প্রচারের জৌলুস অর্জন করে, এই বক্তব্যের প্রাসঙ্গিকতা সেখানেই। অন্য রাজনৈতিক দলগুলির সঙ্গে তৃণমূল কংগ্রেসের পার্থক্য লক্ষ করা দরকার। অল্পবিস্তর সব দলেই বাহুবলীরা রয়েছে, কিন্তু অন্য কোনও দলের ক্ষেত্রে লুম্পেনদের হাতে এতটা নিয়ন্ত্রণ নেই, তৃণমূল কংগ্রেসের ক্ষেত্রে যতটা আছে। তারই বহিঃপ্রকাশ দেখা যাচ্ছে রাজ্য রাজনীতিতে। আইনের শাসন বজায় রাখার প্রশ্নে গণতন্ত্রের সামনে আসল চ্যালেঞ্জ এখানেই। সাম্প্রতিক ঘটনাবলির প্রেক্ষিতে বলা যায়, চিটফান্ডের রাজনৈতিক তাৎপর্য এই সব ঘটনাবলিতেই ক্রমান্বয়ে উন্মোচিত হয়ে চলেছে।

আশার কথা হল, মানুষজন এই মাৎস্যন্যায় মেনে নিচ্ছেন না। আইনের শাসনের বদলে মর্জির শাসন, মানুষের গণতান্ত্রিক অধিকার পদদলিত করে গুন্ডাদের তাণ্ডব, সংবিধানের তোয়াক্কা না করে খেয়ালখুশির অনাচার, এ সবের বিরুদ্ধে জনসক্রিয়তা ক্রমদৃশ্যমান। আপাতত আলোকরেখা এটাই।

**পুলিশ ওরফে দর্শক।** বিধাননগর পুরসভার নির্বাচন, ৩ অক্টোবর। *ছবি: শৌভিক দে*

**অল্পবিস্তর সব দলেই বাহুবলীরা রয়েছে, কিন্তু অন্য কোনও দলের ক্ষেত্রে লুম্পেনদের হাতে এতটা নিয়ন্ত্রণ নেই, তৃণমূল কংগ্রেসে যতটা আছে।**

# যারা যন্ত্র ছিল, তারাই এখন যন্ত্রী হয়েছে

**মইদুল ইসলাম**

**যে কোনও নির্বাচনে যেন তেন প্রকারেণ জয় চাই, কারণ একটি ভোটে জয়পরাজয় লক্ষ কোটি টাকার হিসেবের সঙ্গে সম্পর্কিত। তাই লুম্পেন রাজনীতিক সাধারণ ভোটারের উপর আস্থা রাখার ঝুঁকি নিতে নারাজ।**

গত ৩ অক্টোবর বিধাননগর, আসানসোল ও বালি পুরসভা নির্বাচনে গণতন্ত্রের সম্মান যে ভাবে আর এক বার ভূলুণ্ঠিত হল তাকে নিন্দা করার ভাষা খুঁজে পাওয়া দুরূহ। গত এপ্রিলে পুর নির্বাচনেও শাসক দলের বিরুদ্ধে গণতন্ত্র হত্যার অভিযোগ উঠেছিল, নাগরিক সমাজের একাংশ শাসক দলের কঠোর সমালোচনা করেছিলেন। আজও তাঁরা শাসকের কড়া সমালোচনা করছেন। এবং রাজ্যের কিছু মন্ত্রী এতে গণমাধ্যম ও বিরোধীদের মধ্যে 'শাসকবিরোধী আঁতাঁত' খুঁজে পাচ্ছেন!

প্রশ্ন হল, এই রাজ্যে বিরোধীরা বিভক্ত ও সাংগঠনিক ভাবে দুর্বল হওয়া সত্ত্বেও কেন বার বার বর্তমান শাসক দলের বিরুদ্ধে অবাধ নির্বাচনে বাধা দেওয়ার অভিযোগ উঠছে? এই বিষয়ে পূর্বতন শাসক দল তথা প্রধান বিরোধী জোটের রেকর্ড খুব একটা ভাল নয়। কিন্তু বর্তমান শাসক দল পশ্চিমবঙ্গের রাজনৈতিক সংস্কৃতিতে কয়েকটি নতুন উপাদান যোগ করেছে। সেটা বিশ্লেষণ করতে গেলে শাসক দলের রাজনৈতিক চরিত্র অনুধাবনের চেষ্টা প্রয়োজন। সে জন্য শুধু তাদের সুবিধাবাদী রাজনৈতিক অবস্থান বদলানোর ইতিহাস বিচার করলেই হবে না, তাদের রাজনৈতিক সমর্থনের ভিত্তি ও তার সঙ্গে রাজ্যের রাজনৈতিক অর্থনীতি ও রাজনৈতিক সমাজতত্ত্বও বোঝা দরকার। রাজ্যে কংগ্রেস থেকে উদ্ভূত এই ব্যক্তিকেন্দ্রিক দল একমাত্র রাজনৈতিক শক্তি যাদের মূল জনভিত্তি হল লুম্পেন শ্রেণি। বাকি গুরুত্বপূর্ণ শ্রেণিগুলো (শ্রমিক, কৃষক, মধ্যবিত্ত, বুদ্ধিজীবী, ব্যবসায়ী, শিল্পপতি) এ দলকে সব সময় সমর্থন করেনি। আবার এটাও ভুলে গেলে চলবে না যে শাসক দলের উপরের সারির নেতৃত্ব প্রায় পুরোটাই কলকাতা শহর কেন্দ্রিক এবং অনেকেই পাড়ার ক্লাব রাজনীতি বা দাদাগিরি গোছের বাহুবলী রাজনীতি করে এসেছে। তাদের গ্রামে রাজনীতি করার অভিজ্ঞতা কম। কয়েক বছর আগে সিঙ্গুর নন্দীগ্রামের জমি আন্দোলনকে কেন্দ্র করে তারা প্রথম বার গ্রামে একটা বড় জনসমর্থন খুঁজে পেয়েছিল। সেই জনসমর্থনকে রাজ্য সরকার বিভিন্ন ধরনের আর্থিক অনুদানের মাধ্যমে ধরে রাখার চেষ্টা করছে। কিন্তু এক দিকে জনগণের করে পুষ্ট সরকারি টাকা ও অন্য দিকে সাধারণ মানুষকে ভয় দেখিয়ে লুম্পেন শ্রেণির তোলাবাজির টাকার ভাগ নিয়ে গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব আগামী দিনে শাসক দলের জনসমর্থন হ্রাস পাওয়ার সম্ভাবনাকে ত্বরান্বিত করতে পারে।

শাসক দলের সঙ্গে তথাকথিত চিটফান্ডের মূল পান্ডাদের সরাসরি যোগাযোগ, আর্থিক লেনদেন ও প্রতারক সংস্থাগুলোকে রাজনৈতিক পৃষ্ঠপোষকতার গুরুতর অভিযোগ এখন সবাই জানে। এ হেন অপকর্ম ও আর্থিক দুর্নীতির সঙ্গে জড়িত থাকার অভিযোগে শাসক দলের মন্ত্রী ও সাংসদ কারাগারে দিন অতিবাহিত করছেন। সেই মন্ত্রী জেলে থেকেও আজ অবধি মন্ত্রিত্ব হারাননি। লজ্জার মাথা খেয়ে কলকাতায় 'তোমার আসন শূন্য আজি, হে বির পূর্ণ করো' মার্কা পোস্টার পড়েছে পরিবহণমন্ত্রীকে নিয়ে। রাজ্যের ইতিহাসে এর আগে এ রকম কোনও নজির নেই। সম্প্রতি আদালতে শাসক দলের এক বিধায়ক লোহা চুরির দায়েও দোষী বলে প্রমাণিত। শাসক দলে ভদ্র মধ্যবিত্ত শ্রেণির কিছু গুণী অধ্যাপক ও শিল্পী আছেন যাঁরা অনেকে সাংসদ বা রাজ্যের মন্ত্রী, কিন্তু তাঁদের কথায় শাসক দল চলে না। দলের নেতৃত্ব ভাল করেই জানেন যে পঞ্চায়েত বা পুরসভায় যদি লুম্পেন রাজনীতিকদের বাড়াবাড়ি করতে দিয়ে জয় সুনিশ্চিত করতে না পারা যায় তা হলে বিধানসভা বা লোকসভার মতো বড় নির্বাচনে ওই লুম্পেন বাহিনীদের নির্বাচনী কাজে লাগানো যাবে না। লক্ষণীয়, এই রাজ্যে শ্রমিক ও কৃষকদের মধ্যে বামেদের বরাবর জনসমর্থন আছে, যদিও ২০০৬ সালের পর থেকে সেই জনভিত্তি অনেকটা ক্ষীণ। কংগ্রেসের পিছনে মধ্যবঙ্গে কৃষক ও ব্যবসায়ীদের তাৎপর্যপূর্ণ সমর্থন আছে। ভারতের রাজনীতিবিশারদরা বিজেপিকে সামাজিক ভাবে রক্ষণশীল এবং অর্থনৈতিক দিক থেকে 'বানিয়া পার্টি' বলে চিহ্নিত করেন। এই রাজ্যেও বিজেপির সব থেকে স্থায়ী জনসমর্থন অবাঙালি ব্যবসায়ীদের মধ্যে।

রাজ্যের বর্তমান শাসক দলের উপরের সারির অনেক নেতানেত্রীর রাজনীতিতে হাতেখড়ি হয় সত্তরের দশকে সঞ্জয় গান্ধীর লম্ফঝম্প করা নব কংগ্রেসের আমলে। ভারতের রাজনীতিতে বড় ধরনের লুম্পেনিকরণের প্রবণতা সেই সময় থেকে দেখা গিয়েছিল। পরবর্তী কালে বাম ও গত সাড়ে চার বছরের তৃণমূল আমলে শিল্পক্ষেত্রে পঞ্চাশ ও ষাটের দশকের তুলনায় অন্যান্য রাজ্যের থেকে পশ্চিমবঙ্গ ক্রমে পিছিয়ে পড়ায় এই লুম্পেন শ্রেণির বহর বাড়তে থাকে। তার মূল কারণ হল সংগঠিত ও অসংগঠিত ক্ষেত্রে কাজের অভাব। তৃতীয় বিশ্বের অনেক দেশের মতো এই শ্রেণি তাই বিভিন্ন ধরনের বেআইনি ও অসামাজিক কাজের সঙ্গে যুক্ত থাকে। যেহেতু এরা আইনকানুনকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে জীবিকা নির্বাহ করে তাই পুলিশ এবং আইন রক্ষাকারী যে কোনও সংস্থার সঙ্গে তাদের স্বভাবতই বিরোধ থাকে। এ কথা তাই ভুলে গেলে চলবে না যে রাজ্যে 'পরিবর্তন'-এর পরে লাগামহীন হারে এই শ্রেণির হাতে পুলিশ বার বার আক্রান্ত হচ্ছে। রাজ্যের শাসক দল প্রায়শই নির্বাচন কমিশন থেকে শুরু করে আদালতকে পর্যন্ত চ্যালেঞ্জ জানাচ্ছে। বহু সময় তারা সাংবিধানিক রীতিনীতি মানছে না। আইনের শাসনের বদলে নৈরাজ্য কায়েম হচ্ছে। বহু ক্ষেত্রে শাসক দলের 'সম্পদ'রা মধ্যবিত্ত ভদ্রলোক শ্রেণির (শিক্ষক, ডাক্তার, সাংবাদিক ইত্যাদির) উপরে আগ্রাসী আক্রমণ নামিয়ে আনছে। বললে খুব অত্যুক্তি হবে না যে, রাজ্যের বর্তমান শাসক দল হল উচ্চবর্ণ মধ্যবিত্ত ভদ্র শ্রেণির বিরুদ্ধে লুম্পেন শ্রেণির